প্রয়াতা শ্যামলী খাস্তগীরের জন্মদিনে মিলনসভা

রবিবার ২৩ জুন, সকাল দশটায় নবগ্রাম
হাটপুকুরে এবং বিকেল পাঁচটায় শান্তিনিকেতন
পলাশবাড়িতে শ্যামলীদির বাড়িতে

গান, পাঠ আর আলাপচারিতায় শ্যামলীদিকে স্মরণ।
সকলের আমন্ত্রণ। যোগাযোগ : দেবাশিস ৯৪৩২৮৪৮৬৩৫,
জিতেন ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, মনীষা ৯৪৭৪৫৪৯৭৭৩

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 24 16 June 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা ১৬ জুন ২০১৩ রবিবার ২ টাকা

• চলতে চলতে পৃ ২ • পরমাণু পৃ ২ • ষোলোবিঘা পৃ ২ • পরিবেশ দিবস পৃ ৩ • দণ্ডকারণ্য পৃ ৩ • ম্যানিং পৃ ৪ • গেজি পার্ক পৃ ৪ • বুড়োরাজ পৃ ৪

চাকরি টাকা চাই না, বিচার চাই

অমর সিংহ রথ

আমার মেয়ে প্রীতির ওপর ২ মে দিনেদুপুরে মুম্বইয়ের বান্দ্রা স্টেশনে অ্যাসিড-হামলা হয়। তার চোখ, লিভার, কিডনিতে সংক্রমণ হয়ে যায়। একমাস যন্ত্রণা পেয়ে ১ জুন সে মারা গেছে। এখনও হামলাকারী ধরা পড়েনি, মহারাষ্ট্র সরকার ধরতে পারেনি। আমরা এখনও জানি না হামলাকারী কে। তাই আমি সিবিআই তদন্ত চাইছি। মহারাষ্ট্র সরকার আমাকে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিল। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ আমি প্রীতির জন্য ন্যায়বিচার চাই, আর কিছু চাই না।

কামদুনির মৃত কন্যার মা

আমরা চাকরি, ক্ষতিপূরণ কিছুই চাই না। নেতামন্ত্রীরা কি আমাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? আমরা শুধু মেয়ের খুনির ফাঁসি চাই।

কবি শঙ্খ ঘোষ

যে কোনো দুর্যোগের পরই সরকার যেমন ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে, বারাসতে মেয়েটির নির্মম পরিণতির পর সেটাই করা হয়েছে। এর চেয়ে আপত্তিকর কিছু হতে পারে না। বারাসতের যে প্রতিবাদী মানুষেরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার প্রণতি রইল।

মিডিয়ার শিরোনামে উঠে আসা কামদুনি গ্রামের কথা

শ্রীমান চক্রবর্তী, কামদুনি, বারাসাত থেকে ফিরে, ১৫ জুন •

বাসে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা নেমেছি, তখন বঙ্কিম ফোনে জানাল, যেতে হবে বাসে কৃষ্ণমাটি। কৃষ্ণমাটি নেমে কোনো ভ্যান বা রিক্সা না পেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম কামদুনির উদ্দেশ্যে, একে ওকে জিজ্ঞেস করে। পিচের রাস্তা, পথের আর শেষ হয় না, মাঝে মাঝে কারও কাছে জানতে চাইছি কামদুনি যাবার পথ। রাস্তার বাঁকে বাঁকে চোখে পড়েছে ভেড়িগুলি — বাণিজ্যিক মাছ চাষের জন্য বানানো বিস্তৃত অগভীর জলাভূমি — আর তার মাঝে বা পাশে মাচা। বর্ষার দুপুরে উত্তর চব্বিশ পরগনার এই গভীর গ্রাম দিয়ে দীর্ঘ একা হাঁটার অভিজ্ঞতা আমার আগে কোনোদিন হয়নি। তাই অচেনা গন্তব্য পৌঁছনোর তাড়া দিচ্ছে মনে, আর আমিও পা বাড়িয়ে চলেছি।

হঠাৎ দূর থেকে কয়েকজন চেনা মুখ, কোথাও কোনো মানবতা বিরোধী ঘটনা ঘটলে তার প্রতিবাদে পা মেলাই আমরা, আমাদের বন্ধুস্থানীয়। কাছে আসতে ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, বঙ্কিম অনেকটা এগিয়ে আছে। আমার হাঁটার প্রায় আধ ঘন্টা হলেও আমি এমন কিছু দেখছি না, যা আমাকে কামদুনির সেই অভিশপ্ত দুপুরকে মনে করায়। বৃষ্টিভেজা ভরদুপুরে কলেজফেরতা একটি মেয়েকে পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গায় ধর্ষণ করে, তারপর খুন করে ভেড়ির ধারে ফেলে রেখে গেছে কারা — অভিযুক্তরা সবাই ওই এলাকারই, অন্যান্য পাড়ার।

এরপর তিনের পাতায়

বর্ষণে তিল ও বাদাম চাষে ক্ষতি, কচু চাষে লাভ

কামরুজ্জামান খান, মেচেদা, ১৬ জুন •

তিনদিনের ভারী বর্ষণে তিল চাষ এবং বাদাম চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলায়। হাওড়া জেলার আমতা থানার জয়পুর ব্লকের খরিয়প গ্রামের চাষি জগন্নাথ কোলে এবং সুবোধ ধাড়ার সাথে কথা হচ্ছিল। জগন্নাথ কোলে বললেন, ইনি পাঁচ বিঘে জমিতে তিল চাষ করেছিলেন। প্রচুর বৃষ্টির ফলে প্রায় আড়াই বিঘে তিল মাঠেই নষ্ট হয়ে যায়। তিল চাষ হয় সাধারণত ফাল্গুন মাসে। কাটা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রথমে হাল করে তিল বুনতে হয়। বোনার সময় রাসায়নিক সার দিতে হয়। মাঝে এক খেপ জলও দিতে হয় তিলে ফুল আসার সময়। এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এক বিঘা জমিতে তিল চাষ করতে খরচ হয় প্রায় দু-হাজার টাকা। এক বিঘে জমিতে তিল ফলে ১২০ কেজি। এক কেজি তিলের দাম চল্লিশ টাকায়। এই বছরে আড়াই বিঘে তিল নষ্ট হওয়ার ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিনি তিল ও বাদাম চাষ করেছিলেন পাঁচ বিঘে জমিতে। বাদাম চাষ হয় মাঘ মাসে। বাদাম তোলা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। এক বিঘে জমিতে বাদাম চাষ করতে খরচ হয় প্রায় তিন হাজার টাকা। প্রথমে হাল করে মাটি তৈরি করে সার দিয়ে বাদাম বসাতে হয়। এক বস্তা বাদাম বীজের দাম পড়ে দেড় হাজার টাকা। সার লেবার অন্যান্য খরচও পড়ে আরও দেড় হাজার টাকা। এক বিঘে জমিতে একশো পঞ্চাশ কুইন্টাল বাদাম ফলে। এক কুইন্টাল বাদাম বিক্রি করে আড়াই হাজার টাকা পাওয়া যায়। তিল এবং বাদাম গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এখন দু-বিঘে জমির বাদাম জলের তলায় ডুবে গেছে। ফলে বাদাম চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এই বছর।

সুবোধ ধারার ১৫ বিঘে জমি আছে। বাদাম এবং তিল চাষ করেছিলেন। তাঁরও অর্ধেক জমির তিল এবং বাদাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে জলে। তিনি সাড়ে তিন বিঘে জমিতে কচু চাষ করেছিলেন। কচু চাষ হয় পৌষ মাসে। আর তোলা হয় আষাঢ় মাসে। এক বিঘে জমিতে খরচ হয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এক বিঘে জমিতে প্রায় ১৫ কুইন্টাল কচু ফলে। এক কুইন্টাল কচুর দাম আড়াইশো টাকা। এবছর কচুর ফলন ভালো হয়েছে। পরপর তিন বছর কচু চাষে মোটামুটি ভালোই লাভ পাওয়া যাচ্ছে।

মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত তিপপুর গ্রামের চাষি কোহিনুর বিবি বলেন, তিনি তিন বিঘে জমিতে বাদাম চাষ করেছিলেন। তাঁর এক বিঘে জমির বাদাম জলে নষ্ট হয়ে গেছে। এইভাবে বর্ষার ফলে চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এই বর্ষণের ফলে ফুল চাষিদের অবশ্য আনন্দ হয়েছে। কারণ এই বর্ষার ফলে বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, টগর বেশি পরিমাণে হচ্ছে। ফলে লাভের আশায় তারা দিন গুনছে।

ভর্তির জন্য কলেজের ইউনিয়ন মোটা ডোনেশন চাইছে

মল্লিকা, কলকাতা, ১৫ জুন •

আমি বাংলায় অনার্সে ভর্তির জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছি আশুতোষ কলেজে। ওরা মিনিমাম ৪৫% চেয়েছে বাংলায়, আমার আছে ৫৪%। ২৪ জুন ফার্স্ট লিস্ট টাঙাবে। আমার মনে হয় সেকেন্ড বা থার্ড লিস্টে আমার নাম এসে যেতে পারে। ইতিমধ্যে পাড়ার একজন বন্ধু বলল, ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বল, হয়ে যাবে। আমি ওখানে গিয়ে ইউনিয়নের জিএস আর কয়েকটা দাদার সঙ্গে কথা বললাম। ওরা বলল, হয়ে যাবে, তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা ডোনেশন দিতে হবে। আর একজন বলল, দশ হাজার দিলে হবে। আমি আর ওদের কাছে যাচ্ছি না। আমার আর এক বন্ধু জিওগ্রাফির জন্য ইউনিয়নকে ধরেছিল। ওর কাছে এক লাখ, পঞ্চাশ হাজার এইসব চেয়েছে। আমার পক্ষে এত টাকা তো দেওয়া সম্ভব নয়। দেখি যদি লিস্টে নাম আসে। না হলে মনে হয় চারুচন্দ্রে পেয়ে যাব। আসলে আশুতোষ হলে আমার ভালো হত, ওখানে ফেসিলিটি বেশি। দেখি কী হয়।ছে!

মেলা ঋণ হয়ে গেছে, কোচবিহারের গ্রাম ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর চলল পরিবার

রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ১৫ জুন •

‘কোনটে গেইলে কান্দি কাটি না যাওয়া যায়। হাসি হাসি যাওয়া যায়।’ কথাটা বলেই ট্রেনের সিট হতে একজন মহিলা আমার পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। নয়-দশ বছরের একটি থমথমে মেয়ের পেছনে পেছনে তার মা এসে আমার সামনের সিটে বসলেন। চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে। দুহাতে জল মুছছে আর কাঁদছে। বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের একজন মুসলিম মহিলা। বছর পঁচিশের একজন সহযাত্রী প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ক্যাঁ ভাবি এলায় যান? ভোট বিরাইলে গেইলেন হয়’। উত্তরে মহিলাটি বললেন– ‘ভোট দিয়া হামারা কী করি? হামার মেলা ঋণ হয়া গেইচে। হামরা থাকম না, হামার বাড়িত আইসেন বোল। দেখি যান বাড়িখান।’ তারপর জিজ্ঞাসা, স্বামী-স্ত্রী দুজনে কোথায় যাচ্ছেন? ‘ধুবরি যামো। তিনদিন বাদে আসিয়া তোমার বাড়ি দেখি আসমো।’ বলে ছেলেটি ট্রেনে জায়গা ধরতে গেল।

সকাল সোয়া পাঁচটার পেলব জুলজুলে রৌদ্র। গ্রামটাকে আরও মায়াময় করে তুলেছে। নরম সূর্যালোক বিস্তৃত সবুজে ঠিকরে পড়ে ট্রেন সওয়ারিদের আরও বেঁধে ধরতে চাইছে গ্রামের মায়ায় । কোচবিহারের বামনহাট থেকে ট্রেন আবুতার হল্ট ষ্টেশন থেকে ছেড়ে আমাদের নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে এগোতে লাগল। যত এগোতে লাগল মহিলার নিচের চোয়াল কেঁপে কেঁপে নিচে নেমে আসছিল। ঠোঁট দুটি মুচড়ে-বেঁকে হেঁচকি ওঠার মতো বার বার শরীর ঝাঁকিয়ে বিদায় ব্যথা সামলাচ্ছিল। নীরব, নির্বাক, নিয়ন্ত্রিত আওয়াজের কান্নায় গাল বেয়ে মোটা জলের ধারা এসে আঁচল ভিজিয়ে দিল।

‘কান্দেন না। শুয়া খান’ – সহযাত্রী প্রতিবেশী হিন্দু মহিলাটি (যিনি প্রথমে উঠেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন) দু-টুকরো কাঁচা সুপারি আর দুটি গাছ পান মহিলাটির হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, ‘হাসি হাসি যাও, আল্লাক ডাকো, উমঅরায় দেইখবে’। ‘বইন হামার বাড়িত আসিস বোল দেখিস বোল’ — ‘আসিম’ — আর্তিতে দু’জনের হাত ধরলেন।

পাতলা, শুধু পেশি দিয়ে তৈরি কালো চিক্কন লোকটির বয়েস ৪০-৪২ হবে হয়তো। একটি চিকন জলের ধারা কখন যে ওনার গাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে উনি বুঝতে পারেননি। স্ত্রী কন্যা নিয়ে এই প্রথম যাচ্ছেন বাইরে। জানলা বরাবর চুপচাপ তাকিয়ে আছেন সবুজ প্রান্তরে। পাশে সেই ধুবরিগামী ছেলাটি এসে ওনাকেও একই প্রশ্ন করলেন –

—‘হ্যাঁ দাদা ভোট বিরাইলে গেলু হয়?’

উত্তরে লোকটি ওনার স্ত্রীর মতো উত্তর দিলেন

—‘হামরা এলা ঋণোত পড়ছি। মোর ভোট ভালো এ না লাগে। কী হইবে ভোট দিয়া?’

—‘হ্যাঁ সেইটা ঠিক-ই কথা। হামরা কী করি? কাক ভোট দ্যান আর কাক না দ্যান। তা ওটে যায়্যা ফোন করেন বোল।’

—‘তোর নম্বরখান দে। ওটে যায়্যা ফোন নেমো তার বাদোত তোক ফোন করিম।’

একটু পরে মেয়েটি মায়ের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মহিলাটিরও চোখ বুঁজে আসে। লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম —

— আপনারা কি কাজে যাচ্ছেন?

— হ্যাঁ

— কোথায় যাচ্ছেন?

— ব্যাঙ্গালোর

— ওখানে থাকবেন কোথায়?

— কোম্পানি থাইকবার ব্যাবস্থা কইরবে। খাওয়া দাওয়া হামার, নিজে জোগাড় করা খাইবে।

— মেয়েটি কি করবে?

— থাইকবে হামার সাথে। হামাক হেল্প করবে। সাইডের কাজ তো।

— মজুরি কত করে দেবে?

— ২০০ টাকা।

— কম হয়ে গেল না?

— না, মজুরি ফর শো (for show) আসলে ঠিকাদারের কাছ থাকি কাজ কন্ট্রাক্ট নেমো। তাতে দুই হাজিরা-তিন হাজিরা পড়ি যাবে।

— মেয়েটির পড়াশুনা?

— ক্লাস ফোরোত পড়ে তো, মাস্টারোক কয়া নিছি।

— কাজ সেরে কতদিন পর ফিরে আসবেন?

— ঝামলাত পইড়লে তাড়াতাড়ি আসমো, না হইলে কোন দিন আসম এলায় জানি না।

আপনি কি গুগল, ইয়াহু, ফেসবুক ইত্যাদি ব্যবহার করেন?

সাবধান! আপনার ওপর নজর রাখছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

শমীক সরকার, ১০ জুন, কলকাতা •

মাইক্রোসফট, গুগল, ইয়াহু, ফেসবুক, অ্যাপল, ইউটিউব, এওএল, স্কাইপ এবং পালটক — এই নামগুলি সবাই আমরা জানি ইন্টারনেটের তথা কম্পিউটার দুনিয়ার দানবীয় কর্পোরেশন হিসেবে। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এদের ওয়েবসাইটগুলি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগের জন্য — ইমেল, প্রোফাইল বানানো, চ্যাট, ভিডিও টেলিফোন প্রভৃতির মাধ্যমে। ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে রাজনৈতিক — সমস্ত ধরনের মতামত ও তথ্য আদানপ্রদানের জন্য এগুলো আমরাও ব্যবহার করি। কিন্তু এই কোম্পানিগুলি আমেরিকান রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি, যথা এফবিআই বা এনএসএ-কে আমাদের সমস্ত তথ্যাবলি সরবরাহ করে চলেছে। এদের প্রত্যেকে ব্যবহারকারী, অর্থাৎ আমাদের তথ্যগুলি (নাম, বয়স, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, বরের নাম, কার সঙ্গে কী কী চ্যাট করলাম — তা থেকে শুরু করে আমরা ওইসব ওয়েবসাইটে গিয়ে কী কী শব্দ ‘সার্চ’ করেছি, এমনকী ওইসব ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কগুলোর মধ্যে কোন কোনগুলিতে মাউস ক্লিক করেছি, কোন শহরের কোন কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট সার্ফ করছি — সঅব) তারা যে মহাফেজখানায় রাখে সেই সার্ভার কম্পিউটারগুলি মার্কিন গোয়েন্দাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এবং ওই গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সেই তথ্যগুলি কপি করে চলেছে নিয়মিত। ২০০৭ সাল থেকে চলা এই কর্মকাণ্ডের ডাকনাম ‘প্রিজম’।

সম্প্রতি মার্কিন গুপ্তচর সংস্থার এক চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী এই প্রিজম কর্মকাণ্ডের তথ্য সম্বলিত কিছু নথি ফাঁস করে দিয়েছে ইংলন্ডের ‘দ্য গার্ডিয়ান’ এবং আমেরিকার ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস্’ পত্রিকার কাছে। ৬ জুন এই দুই কর্পোরেট মিডিয়া সেইসব নথির কিছু অংশ প্রকাশ করেছে। আর তাতেই টি টি পড়ে গেছে গোটা দুনিয়ায়। শুধু এই ‘প্রিজম’ কর্মকাণ্ডই নয়, ওই বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি একটি সফটওয়ারও বানিয়েছে, নাম ‘বাউন্ডলেস ইনফরম্যান্ট’। এর মাধ্যমে এই তথ্য থেকে চাইলে তারা এক লহমায় বের করে ফেলতে পারে, আপনি গত দশ বছরে ইন্টারনেটে কার কার সাথে কতক্ষণ চ্যাট করেছেন, কি কি ওয়েবসাইট ভিজিট করেছেন, কোন কোন কম্পিউটার বা মোবাইল বা ট্যাবলেট বা ল্যাপটপ থেকে ইন্টারনেটে ঢুকেছেন — সবই। চাইলে তারা এক লহমায় বের করে ফেলতে পারে, কলকাতা শহরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদির সমর্থক কারা, তাদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পেশা, লিঙ্গ প্রভৃতি। হ্যাঁ, এগুলি তারা করতে পারবে না, যদি আপনি আপনার তথ্য গোপন করেন। যদি আপনি ইচ্ছে করে আপনার কম্পিউটারের পরিচয় জ্ঞাপনকারী নাম্বার, যাকে কম্পিউটার পরিভাষায় আইপি বলে, তাকে গোপন করেন কোনো সফটওয়ারের মাধ্যমে। কিন্তু আপনি যদি এসব করেন, তাহলে মাইক্রোসফট, গুগল, ফেসবুক, ইয়াহু-রা খুব অসন্তুষ্ট হয়। তারা তাদের পরিষেবা আপনাকে প্রায় ব্যবহার করতেই দেবে না।

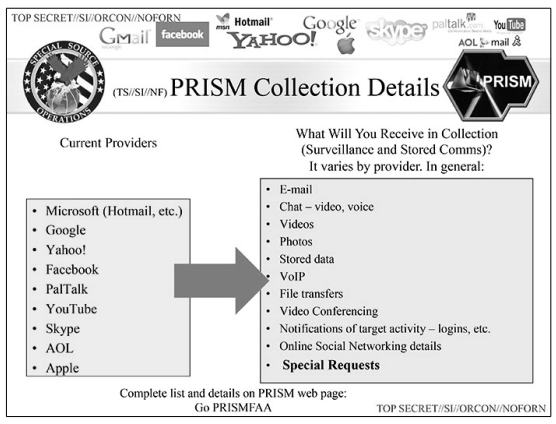

বারে বারে প্রশ্ন করবে আপনাকে, সেসব উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে আপনি ফেসবুক বা জিমেল-এ ঢুকতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার পাসওয়র্ডটি যথেষ্ট চাবিকাঠি নয়। এবং ওরা এইসব প্রশ্ন করবে আপনার ‘অ্যাকাউন্ট’-এর নিরাপত্তার দোহাই পেড়ে।

মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থাগুলির এই গোপন উদ্যোগ ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় উক্ত কোম্পানিগুলি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে অভিযোগগুলি। তবে সরাসরি কেউ স্বীকার করেনি, বরং প্রত্যেকেই বলেছে, ‘আমরা আমাদের সার্ভারগুলি সরাসরি কোনো সরকারি সংস্থাকে ব্যবহার করতে দিই না।’ কিন্তু ইন্টারনেটে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার নিয়ে লড়াই চালিয়ে আসা সংগঠন ইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ওরা সত্যিটা স্বীকার করবে না। কারণ মার্কিন আইনেই আছে, যদি রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে তথ্য নেয়, তাহলে তা প্রকাশ করা যাবে না। আর আরেকটি কারণ সহজেই অনুমেয়, যদি কোনো ইন্টারনেট কোম্পানি স্বীকার করে নেয়, তাদের তথ্য গোপন থাকে না, তাহলে স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তা প্রেমী ইন্টারনেট দুনিয়ায় সেই কোম্পানি জনপ্রিয়তা হারাবে। অন্তত মার্কিন ও ইউরোপীয় বাজারে তো বটেই। এবং অমার্কিন রাষ্ট্রগুলিও ওইসব কোম্পানিগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিতে পারে।

মার্কিন রাষ্ট্রের পক্ষে ওই সার্ভারগুলিতে হাত দেওয়া সহজ। কারণ প্রথমত, ওপরের সবকটি কোম্পানিই মার্কিন দেশের কর্পোরেট। মার্কিন মুলুকে সার্ভার কম্পিউটারে তথ্য রাখা সবচেয়ে সস্তা। ফলে ভারত থেকে ব্যবহারকারীদের তথ্যও তারা ওই মার্কিন দেশের সার্ভারেই রেখে দেয়, যদিও তা ভারতের কোনো সার্ভারে রাখা সবচেয়ে সোজা। কিন্তু সহজের থেকে সস্তার দিকেই কর্পোরেটদের নজর বেশি।

এরপর দুয়ের পাতায়

সম্পাদকের কথা

ধর্ষিত চিত্তভূমি

বাসস্ট্যান্ড থেকে কামদুনি গ্রামে ঢোকার মুখেই কালো পাথরে খোদাই করা স্মারক স্তম্ভ, ‘বাংলার ধর্ষিতা বোন তোমায় জানাই শহিদের সম্মান’। নিচে লেখা ১৫।৬।২০১৩।

রাতারাতি সিমেন্টের ফুট তিনেক দেওয়াল তুলে তার গায়ে গেঁথে দেওয়া হল কালো পাথরের স্মারক। সামনেই ফুল ছেটানো, আর চারধারে রাজনৈতিক দলের পতাকা। যাঁরা স্মারক স্তম্ভ বসালো, তারা তো জানে, কখনোই নিজেদের বোনের জন্য এমন স্মারক বসাতে হবে না কোনোদিন। তাই তো তারা টালির চালায় স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাস করে কলেজে পড়া ‘অপরাজিতা’র জন্য স্মারক স্তম্ভ রচনা করে। আজ সেখানে পুলিশের ছড়াছড়ি। মিডিয়ার বাড়াবাড়ি। অথচ সেদিন বৃষ্টির দুপুরে ভুখা পেটে পথ চলে অপরাজিতা একাকিনী। চলার পথে পাঁচিলের পারে রচিত হল ‘ধর্ষণভূমি’। আজ ‘বুদ্ধিজীবী’দের পাদস্পর্শে ধন্য হল সে ভূমি। এমনই চলছে দিনের পর দিন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আমাদের ধর্ষিত চিত্তভূমি।

জল পেয়ে মুখে হাসি ফুটেছে ষোলোবিঘার

১৫ জুন, খায়রুন নেসা, ষোলোবিঘা, মহেশতলা •

তিন-তিনটে টিউবওয়েল পেয়ে ষোলোবিঘার মেয়েদের মুখে হাসি ফুটেছে। কী কষ্টটাই না করতে হয়েছে জলের জন্য এতদিন। সেটা বোঝা যায় এখন আকড়া ফটকের নয়াবস্তিতে গেলে। ৪৫০টা পরিবার, আড়াই-তিনহাজার লোক। না আছে পানীয় জল, না আছে রান্না-বান্না-স্নানের জল। পনেরো-বিশ মিনিট হেঁটে গঙ্গায় গিয়ে জলের প্রয়োজন মেটাতে হয়। জোয়ারের জল বস্তিতে উঠে এলে সেই নোংরা জলেই কাজ সারে বস্তির মানুষ। পানীয় জলের জন্য ইটভাটায় গেলে মালিকদের মুখ শুনতে হয়। ঘরে ঘরে জ্বর, হাম আর চুলকানির মতো অসুখ লেগেই রয়েছে। আপাতত ষোলোবিঘা এই দুর্ভোগ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। এখন এখানে তিনটে টিউবওয়েল। একটা এনেছে ‘রাইট ট্র্যাক’, দুটো দীপা মুন্সি। আর মহেশতলা পুরসভা যে টাইমকলটা দিয়েছিল, সেটায় জল আসেনি। পুরসভার প্রজেক্টের দিক থেকে পাইপলাইন এসেছে বস্তিতে। কিন্তু পাহাড়পুর জলাধার থেকে লিঙ্ক পায়নি। যাই হোক, টিউবওয়েলগুলোর জল বেশ মিষ্টি, পান করা যায়। নয়াবস্তিতে পুরসভা একটা কল বসিয়েছে, রাইট ট্র্যাক একটা টিউবওয়েল বসিয়েছে। কিন্তু একটাতেও জল আসেনি।

ষোলোবিঘায় যে ৬১০টা ঘর পুড়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে ৩৯০টা কমপ্লিট হয়েছে। মাটি থেকে অর্ধেক পর্যন্ত গাঁথনি করে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা এখনও ছাউনি করেই আছে। এই বর্ষায় তাদের অবস্থা বেশ খারাপ। প্রতি বছরের মতো জলে ডুবে আছে বস্তি। জলনিকাশির কোনো ব্যবস্থা নেই। এক কোমর জল। বেশিরভাগ ঘরে জ্বর, হাম লেগেই আছে। ইউনিসেফের প্রজেক্টে রাইট ট্র্যাক স্বাস্থ্যশিবির করেছে।

প্র থ ম পা তা র প র

গুগল ফেসবুক

মার্কিন রাষ্ট্র খুব দ্রুত এই ‘প্রিজম’ এবং ‘আনবাউন্ড ইনফর্মান্ট’-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ওবামা বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এসব করা হচ্ছে। করা হবেও। নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা — এই দুটিই একসঙ্গে চাই — তা তো হতে পারে না! তবে কতটা নিরাপত্তা চাই আর কতটা গোপনীয়তা চাই — সে বিষয়ে ‘পাবলিক ডিবেট’ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, উইকিলিকস-এর কর্ণধার জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ সহ আরও কয়েকজনের লেখা একটি বই, ‘সাইবারপাঙ্কস’ —এ (২০১২ সালে প্রকাশিত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আরও কয়েকটি শক্তিশালী দেশের এই ধরনের কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু কোনো প্রামাণ্য তথ্য দেওয়া হয়নি। ফাঁস হওয়ার পর দেখা গেল, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জদের আশঙ্কা ও অনুমানের তুলনায় বাস্তবটি আরও ভয়াবহ।

এই ফাঁসের দিনকয়েক পর সিআইএ-র এক চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, স্নোডেন, জানিয়েছেন, তিনি এগুলি ফাঁস করেছেন। তিনি এখন হংকং-এ লুকিয়ে আছেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তিনি বেপাত্তা হয়ে যান।

বিশ্ব জুড়ে পরমাণু সঙ্কটে

নির্মাণে নিচুমানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার, পরপর বন্ধ হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার পরমাণু চুল্লিগুলি

চুর্ণী ভৌমিক, কলকাতা, ৯ জুন। তথ্যসূত্র দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম •

২৮ মে দক্ষিণ কোরিয়ার ‘নিউক্লিয়ার সেফটি সিকিউরিটি কমিশন’ একটি জরুরি অধিবেশনে ঘোষণা করে যে সিঙরই এবং সিনওয়েলসিওং-এর ১নং এবং ২নং চুল্লির সুরক্ষা ব্যবস্থায় গোলমাল রয়েছে। এই চুল্লিগুলির বিশেষ কিছু তারে গণ্ডগোল রয়েছে যা পরীক্ষার রিপোর্টে চেপে যাওয়া হয়েছিল। এই ভুল রিপোর্টের খবর ফাঁস হওয়ার পরপরই এই চুল্লিদুটি কিছুদিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে তার দুটিতে গোলমাল আছে সেগুলি প্রায় ৫ কিমি লম্বা, এবং সেগুলি পুনরায় সারিয়ে পরীক্ষা করে চালু করতে ৫-৬ মাস সময় লেগে যাবে। এর আগে ২০১২-র শেষের দিকে আরও দুটি চুল্লি নিম্নমানের যন্ত্রাংশের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন দক্ষিণ কোরিয়ার ২৩টি পরমাণু চুল্লির মধ্যে ১০টি বন্ধ। এছাড়া সিঙরই ৩নং এবং ৪নং চুল্লিতেও গোলমাল পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সমগ্র শক্তির ৩০ শতাংশ পাওয়া যেত পরমাণু চুল্লিগুলো থেকে। স্বাভাবিকভাবেই দেশে এই গরমকালে শক্তি সঙ্কট শুরু হয়ে গেছে।

জাপানে ২০১১ সালে ফুকুশিমা পরমাণু বিপর্যয় ঘটার পর সেখান থেকে তেজস্ক্রিয় কণা সারা উত্তর গোলার্ধে ছড়ায়। সেই সময়েই একদিন প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়াতে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বৃষ্টি তেজস্ক্রিয় কণা মাটিতে বহন করে নিয়ে আসবে, তা থেকে বাঁচতে এক অভূতপূর্ব সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়াতে। মানুষের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, পরমাণু মানে কি? বড়ো বড়ো পরমাণু বিরোধী মিছিল সংগঠিত হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়াতে। পরমাণু চুল্লিগুলির হাল কি এবং ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, সেই নিয়ে সরকারের ওপর চাপও বাড়তে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় পরমাণু চুল্লির নিরাপত্তা নিয়ে সরকারি স্তরে সক্রিয়তা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত ভারতের নির্মীয়মান কুডানকুলাম পরমাণু চুল্লিতেও নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ব্যবহারের অভিযোগ আছে। এপ্রিল মাসে ওই চুল্লির কমিশনিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বেশ কিছু ভালভ খারাপ বেরোনোর পর তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেছে। কিন্তু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হয়নি।

ফের বিশাল পরমাণু বিরোধী মিছিল জাপানে

কুশল বসু, কলকাতা, ৪ জুন •

২ জুন ফের এক বিশাল পরমাণু-বিরোধী মিছিল কাঁপিয়ে দিল জাপান সহ গোটা বিশ্ব। এমনিতে জাপানিরা মিছিলে হাঁটেন না খুব একটা। কিন্তু সেই জাপানিরাই ফুকুশিমা বিপর্যয়ের একবছর পর ২০১২ সালের জুলাই মাসে ব্যাপক জমায়েত করেছিল টোকিওতে। জমায়েতে মানুষের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার। গত বছর জমায়েতের কারণ ছিল সরকারের দুটি পরমাণু চুল্লি চালু করার সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য ২০১১ সালের মার্চ মাসে জাপানে সুনামির কারণে ফুকুশিমার পরমাণু বিপর্যয়ের পর সে দেশের পঞ্চাশের বেশি পরমাণু চুল্লির সবকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরমাণু বিপর্যয়ের এক বছর বাদে সরকার ঘোষণা করে, তারা ফুকুই প্রিফেকচারের ওই-তে অবস্থিত দুটি পরমাণু চুল্লি চালু করবে।

যাই হোক, এই বছর সরকার ঘোষণা করে জাপানি পরমাণু নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ যে চুল্লিগুলিকে চালু করার সম্মতি দেবে, সেগুলি আবার চালু করা হবে। এই সিদ্ধান্ত জাপানি জনতা মেনে নিতে পারেনি। সেখানকার পরমাণু প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীরা প্রায় ৮০ লক্ষ সই সংগ্রহ করেছে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। আর ২ জুন প্রায় ৬০ হাজার মানুষ রাজধানী টোকিও-র শিবা পার্ক থেকে হেঁটে পার্লামেন্টে যায়।

পুস্তক পরিচয়

‘ভাগাড়ে যেন লুঠের মাল এসে পড়েছে...’

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৫ জুন •

ঝক্কি মাসির সঙ্গে অহল্যা যখন স্টেশনে এল, স্টেশনে তখন থিকথিকে ভিড়। স্টেশনের বাইরে গাঢ় অন্ধকার। লাইট পোস্টের বাতিগুলো শুধু শীতের ভোরে জবুথবু হয়ে ক্লান্ত আলো ছড়াচ্ছে। ... দূর থেকে আসা আবছা একটা আলোর ফুলকি দেখতে পেয়ে যাত্রীরা সব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। চাদর সোয়েটার কাপড় সেঁটে নিয়ে যেন যুদ্ধে নামার জন্য তৈরি হচ্ছে সব। নামখানা-লক্ষ্মীকান্তপুরের ট্রেনে উঠতে গেলে যাত্রীদের যুদ্ধ করতে হয় বইকি!

পাঁচের দুই খোপ কোথায় পড়ে ঝক্কি মাসির তা জানা। অহল্যাকে মাসি শক্ত করে ধরে। ট্রেনটা ঝমঝম শব্দ করে স্টেশনে ঢোকে। আগে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি গুঁতোগুঁতি লেগে যায়। ঝক্কি মাসি অহল্যাকে নিয়ে সবার পিছনে। ঝক্কির হুড়োহুড়ি করার দরকার নেই। এই খোপে তার নিত্যদিনের পরিচিত যাত্রীরা জায়গা দখল করে বসে আছে। সে খোপটি শুধু তাদের জন্য বরাদ্দ। সেখানে নতুন মুখের প্রবেশ নিষেধ। যদি কোনো নতুন যাত্রী জোর করে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তো তার দিন মাটি হয়ে যায়। এপার ওপারের নিত্যযাত্রীরা এমন অসভ্যতা শুরু করে যে তাকে গন্তব্যের আগেই খোপ ছেড়ে পালাতে হয়।

ঝক্কির সাথে অহল্যাকে দেখে কামরায় যেন একটা হুলুস্থুলু পড়ে গেল। ভাগাড়ে যেন লুঠের মাল এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা বখাটেগুলোর পর্দাহীন সব কথাবার্তায় কলরব বাড়ছে। জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ চাদর ঢাকা দিয়ে এক অঙ্গে লীন হয়ে, শীতের সঙ্গে লড়াই করতে শরীরের উষ্ণতা উপভোগ করছে। গোলযোগে চাদরের পর্দা ফাঁক হয়ে ঘোরলাগা ঘুম জড়ানো চোখগুলো ছুটে আসে অহল্যাদের দিকে। কী ব্যাপার?

— আমার মাতা খাস মাসি, তুই আমার খোপে আয়। অন্যজন বলে।

— সে মাসির বিচের সাত বছর ধরে মাসির জন্যি মারপিঠ করে জায়গা নে আসতিচি। মাসি কি আমার কতা ভাববেনে। আর একজনের বাজখাঁই গলা ঝলসে ওঠে,

— আরে নম্পটরা চুপ কর তো সব। এটা কি মগের মুলুক নাকি। জুলুমবাজি হচ্ছে? শালা যত সব নষ্টের দল। মা বোনিদের সম্মান দে কতা বলতি শিকলিনি। তারপর গলার সুরটা খুব নরম করে বলল,

— এ খোপে কে না জানে কেষ্টদার পরে আমার নাইন। বিদ্যে বৌদি কেষ্টদার বগলে ঢুকেছে। এ আমার বগলের মাল তোরা কোত্থেকে পাবি রে হারামজাদারা।

ঢ্যাঙা কালো রগঅটা বেঢপ ছেলেটা ঝক্কি মাসিকে সাক্ষী মেনে, অহল্যার দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে বিদঘুটে হাসি হেসে ওঠে। অহল্যাকে জায়গা দেওয়ার জন্য প্রায় সবাই যেন মরিয়া। এ বলে মাসি এপারে আয়। ও বলে মাসি আমার কাচে দাঁড়া।

অদ্ভুত জীবন এইসব ভোরের ট্রেনের নির্মাণ কর্মী আর ঝিয়ের কাজ করতে যাওয়া পুরুষ মহিলাদের, এরা বাড়ির স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গ পায় খুবই কম। দিনে রাতের বেশির ভাগ সময় তাদের কাটে বাড়ির বাইরে। ভোর চারটেয় গাড়ি ধরতে রাত তিনটের সময় উঠতে হয়, রাতে ফিরে রান্না বান্না করে শুতে শুতে এগারোটা। শুলে আর হুঁশ থাকে না। নিত্য যাতায়াতে বেওয়ারিশ হয়ে থাকলে যন্ত্রণার অন্ত থাকে না। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো দাবিদারহীন কুলগাছের মতো যার ইচ্ছে হয় ঢিল ছুঁড়ে আহত করে যায়। ফলে মহিলারা খোপে এলে কারো না কারো দখলে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মতো এক চাদরের তলায় লেপ্টে ঘুমাতে ঘুমাতে শহরে চলে যায়। আবার ঠাট্টা মস্করা করতে করতে সময় পাশ করে ঘরে ফেরে। যারা নিত্যযাত্রী এসব ব্যাপার তাদের গা সওয়া। সমাজের থিতু মানুষদের চোখে এসব নষ্টামী, অসহনীয়। তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। তারা তাদের ছন্দে যায় আসে। ভদ্রতা দেখালে বাক্যবানে উলঙ্গ করে ছাড়ে। দলে সাধারণ যাত্রীরা কেউ ওদের সাথে মুখ পাততে চায় না

নোত্তো নেঙো দিয়ে গোঁত্তা মারে তার গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা যমুনাকে।

— এ্যাই যবু ওটনা। মেয়েটারে এট্টু বসতে দে না।

যমুনা আড় চোখে অহল্যাকে দেখে নিয়ে পাল্টা গোঁত্তা মারে নোত্তোকে।

— শালা আঁড়খোড়, ডবগা মেয়েমানুষ দেকলি জিবি জল আসে না-রে?

ভুতোর বগলের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে জবা বলে,

— আত জেগে নোত্তোর খোল শুইকে উটেচে রে যমুনে। তোর গোঙ্গা জল নে ওর মুকি এট্টু দেনা।

জবার খ্যাপাটে হাসিতে অনেকেই যোগ দিতে হাসির হুল্লোড় ওঠে সারা কম্পার্টমেন্টে।

ওপরে ‘অহল্যা’ গল্পের একটি অংশ দেওয়া হল। এই গল্পটি ‘বাঘের রাজত্বে : সুন্দরবন বিষয়ক গল্পগ্রন্থ’ নামে একটি গল্প সংকলনের অন্তর্গত। ২৬টি গল্পের সংকলন। লেখক প্রদীপ কুমার বর্মন। প্রকাশক নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশনা, জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। লেখকের মোবাইল : ৯৭৩২৮৯৫৬৪১। প্রকাশকের ফোন : ৭৬৯৯৪৫৬৮৩২ ও ইমেল : nazibulislam-mondal@rediffmail.com. *প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১২। বিনিময় মূল্য ১৩০ টাকা।*

যন্ত্রাংশ খারাপ, বন্ধ হয়ে গেল আমেরিকার দুটি পরমাণু চুল্লি

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৫ জুন •

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত সান ওনোফ্রে পরমাণু প্রকল্পের দুটি পরমাণু চুল্লি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। ৭ জুন প্রকল্পটির ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর চুল্লিদুটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে প্রকল্পটির মালিক সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া এডিসন কোম্পানি। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে প্রতিটি এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই দুটি চুল্লির কিছু যন্ত্রাংশ (বাষ্প জেনারেটর) পাল্টানো হয়। কিন্তু ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ৩ নং চুল্লি থেকে সামান্য তেজস্ক্রিয় বাষ্প নির্গত হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে, নতুন বসানো বাষ্প জেনারেটরের ৩০০০ টিউবে লিক আছে, অন্তত ১৫,০০০ জায়গায় লিক পাওয়া যায়। এরপর অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় পরমাণু চুল্লিদুটি। ওই লিক সারানো প্রচুর খরচের ব্যাপার, তাই এই বছরের জুন মাসে চুল্লিদুটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কোম্পানি। উল্লেখ্য, ক্যালিফোর্নিয়ার এই পরমাণু প্রকল্পটির প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষ পথে নেমেছে সেই শুরু থেকেই। গত শতকের সত্তরের দশকের শেষের দিকে, যখন এই প্রকল্পটির ২ এবং ৩ নং চুল্লি তৈরি হচ্ছে, তখন বড়ো বড়ো মিছিলও হয়েছে এর বিরুদ্ধে। ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর সেই পরমাণু প্রতিরোধ আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ২০১২ সালের মার্চ এবং মে মাসে সান ওনোফ্রে প্রকল্পের বাইরে প্রতিবাদ জমায়েত হয়। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী এস হফম্যান সান ওনোফ্রে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়াকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রকল্পে জমে থাকা জ্বালানি ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের কী ব্যবস্থা হবে তা চিন্তার বিষয় হয়ে থাকবে। এস হফম্যানের ওয়েবসাইট http://acehoffman.org/

চলতে চলতে

‘কিন্তু ও কেন অমন করবে, ও তো আমায় রেখেছে, নাকি?’

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ১ জুন •

চলতে চলতে দেখি, শুনি। সিনেমার মতো। টুকরো ছবি, সংলাপ। সবটা মিলিয়ে একটা গোছানো গল্পও নয়। সন্ধ্যের শুরুতে চৌরঙ্গী রোডে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে ফুটপাথের চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে দেখলাম দুজন দোকানদার দুধের ডেকচির সরায় তিন ভাঁড় চা সাজিয়ে ‘ও দাদা ও দাদা বলে ডাকাডাকি করছে’। ফুটপাথের রাস্তার দিক ঘেঁষে দোকান, উল্টোদিকে ব্যাঙ্কের বিল্ডিংয়ের নিচে চায়ের অর্ডার যারা দিয়েছে, তারা সদ্য নামা অন্ধকারে গুলতানি করছে। অফিস ফেরত তিন যুবক ও এক যুবতী। সকলের হাতে মোবাইল, কাঁধে ব্যাগ — কাঁধে মানে পিঠে, দুইদিকে ফিতে লাগানো — যেমন আমরা স্কুলে নিয়ে যেতাম। আমার বয়সের চোখে দোষ আছে — এখনও প্রথম দর্শনেই ওরকম ব্যাগ দেখলে আমার ব্যাগের বাহককে শিশু মনে হয়। ওদিকে যুবকরা যুবতীকে ঘিরে এতই ব্যস্ত যে দোকানদার দুজনের ডাক কানেই নিচ্ছে না। দোকানদার দুজনও ওই যুবকদেরই বয়সি — তারা ওই যুবতীর দিকে ইশারা করে নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হাসছে। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। একজন যুবক যুবতীকে বলল, ‘সুমনাকে ডেকে নেব, ওর মোবাইল নাম্বার বল।’ নম্বর পেয়ে সে যুবক মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই যুবতী আরেক যুবককে বলল ‘তুই আমায় চাটছিলে কেন বলতো’। প্রশ্নকারী যুবক আত্মরক্ষার স্বরে বলে ‘আমি তোকে চাটলাম কখন? ধ্যাৎ, তুই বুঝতে পারিসনি।’ আবার আমার বয়সের কানে লাগল — যদিও আমি জেনে গেছি — ‘চাটা মানে আমাদের সময়ের বোর করা’।

সন্ধ্যের শেষের দিকে যুবক যুবতীদের স্থান-কাল-পাত্র সব পাল্টে গেল। আগে ওটা ছিল চৌরঙ্গী রোডের উত্তর প্রান্ত, এখন দক্ষিণ প্রান্ত। এই দৃশ্যে চাওয়ালা নেই। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জায়গা নিয়েছে পি.সি.চন্দ জুয়েলার্স। তার ভিতর এত লম্বা লাইন পড়েছে যে বাইরে গুণে গুণে তিরিশ জন বন্ধ দরজায় দারোয়ানের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে — দেখলেই মনে পড়ে যাবে কাগজে লিখছে সোনার দাম হঠাৎ প্রতি ভরিতে ৩৩ হাজার থেকে ২৬ হাজার টাকায় নেমে গিয়েছে। আমার যুবক-যুবতীরা এই লাইন থেকে একটু দূরেই সোনার চেয়ে অনেক দামি একটা নীল প্লাস্টিকের টুকরো ফুটপাথে বিছিয়ে বসে গেছে। ওটাই ওদের ঘর-বাড়ি, ওর ওপর ছালায় বাঁধা ওদের গোটা সংসারের পাশে চটের কাঁথায় ওদের নবজাতক সদ্য ঘুমিয়েছে। তার গায়ে এক হাত দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে আরেকহাত তুলে যুবতী মা এক যুবকের দিকে নির্দেশ করে পাশে বসা আরেক যুবককে সালিশ মানছে, ‘সে বলছে আমি মানছি, কিন্তু ও কেন অমন করবে, ও তো আমায় রেখেছে, নাকি?’ তার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় এবং বক্তব্যের অভিঘাতে সোনার দোকানের লাইনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা উচ্চকিত হয়ে এদিকে চাইছে। আমি এই নাটকীয় সংলাপের সামনে আর দাঁড়াইও না। অনুমান করে নিই এর আগের দৃশ্যে এই যুবতী আরেক যুবতীকে বলেছিল ওই যুবককে দেখিয়েই, ‘ও আমায় নেবে বলেছে’। চলতে চলতে এটুকু অনুমান করে নেওয়া যায়। ‘রাখা’ ‘নেওয়া’ এইসব শব্দগুলো কোনো মহিলা সম্পর্কে শুনতে খারাপ লাগলেও এটা আমাদের নিচের মহলের দস্তুর। ওপরের মহলে সোনার জেল্লা লেগে ভাষার কিছু হেরফের হয়।

‘ওই যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো হয়েছে ওগুলো আগে ছিল না, ছিল গাছ, ছিল পাখি, ছিল শেয়াল’

৬ জুন, কৃষ্ণেন্দু, কলকাতা ডানলপ

৫ জুন বিশ্ব-পরিবেশ দিবসে বিকেলে গিয়েছিলাম আনন্দ পাঠশালার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গাছ লাগাতে। বিটি রোডের ওপারে রথতলার মোড়ে নেমে বাঁহাতে নজরুল মঞ্চকে রেখে একটু এগিয়ে ডানদিকে খালপাড় ধরে যে পল্লি সেখানে ওদের ঘর-সংসার। খালপাড় ধরে যেতে চোখে পড়ল বড়ো বড়ো গাছের সারি আর তার নিচে ছোটো ছোটো ঘর। যেন অরণ্যের মাঝে কুঁড়ে ঘর। খালের উল্টোদিকে বাঁপাশে একটু দূরে এখন বিশাল বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি যার গা থেকে ঝুলছে — সাদা সাদা বাক্স, ঘর ঠান্ডা করার যন্ত্র। একসময় ওখানেও ছিল অনেক গাছপালা। রাস্তাটা নাকি চলে গেছে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।

তখন বিকেল ৩টে হবে। রঞ্জনের সঙ্গে ওখানে পৌঁছাতে দেখা হল রাজেশ, মমতা, সুমনা, মিতালি, কামু, বৈশাখীদের সঙ্গে। একটু পরে দেখি ওদের হাতে নিজেদের হাতে আঁকা পোস্টার। বিষয় পরিবেশ। রাজেশ ওর বন্ধুদের নিয়ে পোস্টার টাঙাতে লেগে গেল। কোনো পোস্টারে সবুজ গাছ আর তার পাশে মজা-বাঁশ, ওরা জানতে চেয়েছে কবে পরিষ্কার হবে এই দুর্গন্ধযুক্ত খাল, কোনো পোস্টারের বিষয় একটা গাছ আমাদের যা দিয়ে চলেছে উপকার মূল্যে তা কত! কোনো পোস্টারে কারখানার ছবি, বিষয় শিল্প কেবলই দূষণ ছড়ায়। সাইকেল সমাজের বন্ধুদের দেওয়া কিছু পোস্টারের বিষয় ‘দূষণহীন যান সাইকেল’। পোস্টারগুলোর প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। পোস্টারগুলো তৈরি করেছে মমতা, রঞ্জন, সুমনা, রাজেশ, প্রিয়াংকারা।

বেলা পড়ে আসছে .... রঞ্জন কিছু বলতে শুরু করল ছোটো বন্ধুদের কাছে, ধীরে ধীরে ভিড় জমে গেল ছোটো বন্ধু ও তাদের মায়েদের। রঞ্জন বলে চলেছে কোনো বাকযন্ত্র ছাড়াই ... ‘ওই যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো হয়েছে ওগুলো আগে ছিল না, ছিল গাছ, ছিল পাখি, ছিল শেয়াল ... এইদিকের গাছগুলোও আর থাকবে না, বড়ো রাস্তা হবে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। গাছ না থাকলে খাব কি? খাবার পাব কোথায়? এখানে আমরা গাছ লাগাব, শুধু এখানে নয় এই জায়গার বাইরে গোটা এলাকাতেই যেখানে পারব গাছ লাগাব।

বিশ্বের অনেক জায়গায় এক আন্দোলন শুরু হয়েছে, ... ছোটো ছোটো স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেখানে পারে গাছ লাগায়, রাস্তার ওপরেও গর্ত খুঁজে গাছ লাগায়। শিল্প আমাদের কিছু দেয় না, আর যাই দিক খাবার দেয় না। বিজ্ঞান আমাদের কাছে আজ আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। তাই গাছ চাই-ই-চাই, গাছ আমরা লাগাবই।

আঁধার ঘনিয়ে আসছে, রঞ্জনকে থামতে হল। শুরু হল গান, প্রথমে মিলিত কণ্ঠে ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ গলা মেলালো — বৈশাখী, সুমনা, গোপা। তারপর একে একে মোহনা গাইল বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়’, গোপা (ওদের গান শেখার দিদি) গাইল ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরও আরও দাও প্রাণ ...’।

সবশেষে, আসল উৎসব গাছ পৌঁতার পালা, এবারে লক্ষীর সঙ্গে যোগ দিল ছোটোরা, একে একে ওদের ঘরের পাশে কোথাও পৌঁতা হল ‘বাগানবাহার’ তো কোথাও ‘বেল ফুল’ কোথাও জুঁই ফুলের চারা, সবাই মিলে একসাথে গাছে হাত রেখে মাটিতে রোপন হল চারাগাছ। কোনো ঘর থেকে বেরোল শাবল, কোনো ঘর থেকে ভেসে এল শঙ্খধ্বনি। সন্ধ্যে নেমেছে তখনও ছোটো ছোটো বাচ্চারা আসছে ‘আমাকে একটা দাও’। ‘আমাকে দিলে না’। গাছ পৌঁতার পর লজেন্স, আর মিষ্টিমুখের পালা। গোপা নিয়ে এসেছিল লজেন্স, সাইকেল করে গিয়ে হিমাদ্রি নিয়ে এল মিষ্টি। এসেছিল আর মিত্রও।

ফিরে আসছি, পিছনে পড়ে রইল এক সুন্দর বিকেল। সন্ধ্যে নেমেছে, ওই পাড়াতেই এক তেলেভাজার দোকানে উনুনে আঁচ পড়েছে, চায়ের দোকান, গাড়িতে বিক্রি হওয়া ফুচকা, একপাশে ট্যাপ কলের জল, কলতলায় মায়েরা বাসন মাজছেন, সব মিলিয়ে এক সুন্দর ছন্দময় বিকেল।

রাজেশের কথাগুলো মনে পড়ছিল .... কাকু ওই যে দেখছো ফ্ল্যাটবাড়িগুলো, ওখানে অনেক শিয়াল ছিল, ওই যে ঝিলটা ওখানে বর্ষার সময় গঙ্গার ইলিশ ভেসে আসত ...। রঞ্জনকে একটি বাচ্চা মেয়ে বলে ‘কাকু তোমরা আর পড়াতে আসো না কেন’? ‘আমাদের তো এখানে পড়ানোর ঘর নেই, পড়াতে বাধা পাই’। ‘আমাদের নিজস্ব একটা কিছু থাকলে বেশ হত না! কেউ বাধা দিতে পারত না।’

ওদের সংশয়, আর কতদিন এই সব গাছ, পরিবেশ ওরা রক্ষা করতে পারবে। তার কারণ কামারহাটি পৌরসভার নির্দেশ — বাসিন্দাদের সরে যেতে হবে। রাস্তা চওড়া হবে। গাছগুলো হয়তো থাকবে না, কারণ ওরা তো বাসিন্দাদের মতো করে সরে যেতে পারবে না। যদিও কামারহাটি পৌরসভাই ওই দিনে পরিবেশ দিবস পালন করেছে অন্যত্র গাছ রোপন করে।

মেটিয়াবুরুজকে পরিচ্ছন্ন সুন্দর রাখার জন্য বিনীত প্রস্তাবনা

শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াবুরুজ

সৌন্দর্যচেতনা এক সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এই নান্দনিক গুণাবলীকে অর্জনও করা যায়। প্রয়োজন হয় একটু রুচিবোধের। এই চেতনা জাগরিত হলে জীবনটাই হয়ে ওঠে সৃজনশীল — সর্বাঙ্গসুন্দর। একটু ভালোভাবে বাঁচবার তাগিদ থেকে, সুন্দর সুস্থ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকে এই চেতনা মনের গভীরে উঁকি মারে। উঁকি দেওয়া ভাবনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা একটু লালন করলেই ব্যক্তিমন সুন্দরের পূজারী হয়ে ওঠে। সুন্দরের ডাকে সাড়া দিলে দেহ-মন-পরিবার-পারিপার্শ্বিকতাকে নিষ্কলুষ আনন্দ দেওয়া হয়। পারিবারিক জীবন কলহহীন, সহমর্মিতাপূর্ণ হোক সকলেই কামনা করি। সেই সঙ্গে পরিবারের আস্তানা বাড়িঘরকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তোলার ভাবনাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারলে এক স্বর্গীয় পরিবেশ বাড়ির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। ব্যক্তির এই ইচ্ছা সর্বত্রই প্রশংসনীয়।

সুন্দরের ভাবনা রুচিবোধপ্রসূত। তাই আমরা নিজেদের সাজপোশাকে, ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছদে, স্ত্রীকে দৈহিক অলঙ্করণে সাজিয়ে তুলি, আমাদের আবাসগৃহটি কৃত্রিম অলঙ্করণ না করে প্রকৃতির লতাপাতার জারিজুরিতে (মোড়কে) সাজিয়ে তোলা হলে বাড়িতেই তপোবনের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া, সুশীতল সমীরণের একটু ছোঁয়ায় প্রাণ জুড়ায়, পরিবেশবান্ধব এই প্রচেষ্টা প্রশংসাও কুড়ায়। খালধারীর নূর হোসেন মল্লিককে এই প্রচেষ্টার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সোজাসাপটা বলে ফেললেন, ‘বাড়িতে গাছপালা (ফুলের) লাগানো বা তার চর্চা করলে বাড়ির পরিবেশ প্রাণবন্ত, জীবন্ত হয়। কিন্তু পারিবারিক পরিস্থিতি সুখকর হলে সৌন্দর্যরক্ষার আগ্রহটা বহুগুণে বেড়ে যায় এবং তা সার্থকও হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘মানুষ ইচ্ছা করলে বাড়ির উঠানে, বারান্দায় বা দরজার পাশে গুটিকয়েক গাছ, ফুলের টব কিংবা পাতাবাহার গাছের সমাবেশে কংক্রিটের বাড়িকে পর্ণকুটিরের আদলে সজ্জিত করে গড়ে তুলতে পারে।’ রিজওয়ানা বেগমের কাছে শোনা গেল প্রকৃতির বার্তা। তিনি বলেন, ‘আশেপাশে গাছপালা থাকলে প্রকৃতি খুশি হয়, সেভাবে এরা এখনও আমায় ভোলেনি। সুতরাং সব মানুষ দোষী নয়।’

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতার নামান্তর। এই পবিত্রতা চাই পারিপার্শ্বিক পরিবেশেও। বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নর্দমাটা পরিষ্কারের অভাবে মাঝেমধ্যেই দুর্গন্ধ ছড়ায়। যদি একটু যত্ন নেওয়া যায় তাহলে ওই নিকাশিনালাই সুন্দর পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে — – এই অভিমত বেশ কয়েকজনের। সফির কাঠগোলার রিজওয়ান আলি থান্দার শোনালেন, ‘আমরা সপ্তাহে অন্তত একদিন যে যার বাড়ির সামনের নর্দমাটা যদি পরিষ্কারের উদ্যোগ নিই কিংবা অপরকে নোংরা আবর্জনা, কাপড়ের ছাঁট, সবজির খোসা ফেলতে বাধা দিই, তাহলে সারাবছর দুর্গন্ধে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে না।’

রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন থাকলে পদে পদে গতিরোধ হয়, ঘৃণায় সারা শরীর ঝিমঝিম করে। মশামাছির আতুরঘর এই পথঘাট পরিষ্কারের জন্য পুরসভার লোকজনের আপনি আপনার বাড়ির সামনের রাস্তা একটু ঝাঁট দিলেন বা বাড়ির কোনো সদস্যের দ্বারা তা করিয়ে নিলেন, দেখবেন আপনার দেখাদেখি অন্যরাও অনীহাকে পেছনে ফেলে পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়েছে। সকলের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় আপনার পাড়ার পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে। জনৈক পথচারী জানালেন, সংসারের চাওয়া-পাওয়ার সময় দিয়েও সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব, যদি আমার ইচ্ছা থাকে। তিনি বলেন, ‘এক পাড়ার দেখাদেখি অন্য পাড়াও অংশগ্রহণ করবে। বড়োদের দেখাদেখি ছোটোরাও এগিয়ে আসবে। তারা বাড়ি বা পাড়া থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। এর মধ্য দিয়েই তাদের দেশ ও সমাজভাবনা জাগ্রত হবে’ হাজিরতনের লুনা ড্রেসেস-এর জয়নাল আবেদিন সাহেব দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বাড়ির পরিবেশকে বিভিন্ন গাছপালা লাগিয়ে সুন্দর রেখেছেন। রবীন্দ্রনগরের ডি ব্লকের দেবু মুখার্জি গাছপালা ভালোবাসেন। বাড়ির আশেপাশের পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য তিনি সদা সচেতন। এরকম মানুষ তো মেটিয়াবুরুজের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেই আশার আলো জাগিয়ে রেখেছেন।

বিধানগড়ের কেকা চক্রবর্তী একটু সমালোচনার সুরেই বললেন, ‘ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দাদের আর একটু সচেতন হওয়া উচিত। তারা অনেকসময় ওপরতলা থেকে নোংরা আবর্জনা, আনাজের খোসা ফেলে দেয় বা কখনো সিড়ির তলায় জমিয়ে রাখে। এটা সমর্থনযোগ্য নয়।’ তিনি আরও বলেন, পাড়ার ক্লাব-সমিতিগুলোকে উৎসাহদান করলে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তারা এগিয়ে আসবে। ‘এসো শ্যামল সুন্দর’ — কবির এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসুন না আমরাই চেতনার রঙে সবকিছুকে রাঙিয়ে তুলি। গোলাপ আরও সুন্দর হয়ে উঠুক।

দণ্ডকারণ্যে এই রক্তপ্লাবন বন্ধ করতে আমরা কি কিছু করতে পারি?

শ্রোতা বঙ্কিম, ৮ জুন •

এই নিয়ে কথা বললেন ভি। বি। চন্দ্রশেখরণ, কলকাতার বেলেঘাটায় গান্ধী ভবনে ৮ জুন শনিবার বিকেলে। গোটা কুড়ি লোকের সাথে কথা বলছিলেন তিনি, প্রবৃদ্ধ মানুষ, গান্ধীবাদী, পরনে লুঙ্গির মতো করে ধুতি আর কুর্তা, কপালে ফোঁটা কাটা, হাতের নাগালেই শ্বাসকষ্টের জন্য মজুত আছে ইনহেলার। সঞ্চালিকা তাঁর নাম ভুল বলতেই স্মিত হাসি হেসে আঙুল তুলে ‘ভি’ নির্দেশ করলেন। কথা বলেন কম। দীর্ঘজীবন দণ্ডকারণ্যে আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। আজ প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ ধরে তাঁদের ‘ছত্তি মহাত্মা গান্ধী আশ্রম’ অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম জেলায় কাজ করে চলেছে। এর আরেকটি শাখাও আছে। এই বয়সেও সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করে বেরিয়ে পড়েছেন দণ্ডকারণ্যের মানুষের শান্তি সমৃদ্ধি ও ন্যায়ের জন্য। বললেন, আমাদের কাছে কোনও সমাধান নেই। তবুও আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের কথা শোনা ও শেখা। আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে সমানুভূতির সঙ্গে শোনা। আমরা মাওবাদী কিংবা সরকারকে পরস্পর কথা বলার জন্য কোনো প্রস্তাব অথবা নির্দেশ দেব না। কিন্তু তারা যাতে আমাদের সাথে কথা বলে, তার চেষ্টা করব। আমাদের কাজের ভিত্তি হবে অহিংসা। তা সরকার কিংবা মাওবাদী যেই আমাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরুক না কেন আমরা কোনোরকম প্ররোচনামূলক কাজকর্ম অথবা মিটিং মিছিল তথ্যানুসন্ধান বা প্রকাশনা করব না। তবে কোথাও কোনো হিংসার ঘটনা ঘটলে স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে গিয়ে শোক জ্ঞাপন করবে নির্বিচারে প্রতিটি মানুষের জন্য। আদিবাসী মানুষদের মধ্যে অন্তত পাঁচ বছর থেকে তাদের কথা শোনার মাধ্যমে কোনো একটা কার্যকর পথ সন্ধানের কাজ করার আহ্বান রাখলেন কলকাতার শ্রোতাদের কাছে। (ভি বি চন্দ্রশেখরণ 09490109328, 08297976970, verivaan2049@yahoo.com, antarbharatid2010@gmail.com)

প্র থ ম পা তা র প র

কামদুনি থেকে ফিরে

কিছুক্ষণ পর দূর থেকে কিছু মানুষের মাথার জটলা দেখতে পেলাম। মনে মনে একটা আতঙ্ক হচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে কী বলব? কেন যাচ্ছি কামদুনি, তাও তো নিজের কাছে স্পষ্ট নয়। কিছুদূর এগোতে দেখি একটা পুলিশ ভ্যান গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, তাতে ভর্তি পুলিশ। যত এগোচ্ছি তত চারপাশে তাকাতে দ্বিধা হচ্ছে। মনে মনে ভাবছি, অচেনা গ্রামে কেউ ঢুকলেই গ্রামের লোকেরা চিনতে পারে; কারণ ওরা সকলে সকলকে চেনে। এখানকার মানুষ সেদিনের ঘটনার পর যে ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেছে, একাধিক পুলিশ ভ্যান জ্বালিয়ে দিয়েছে, নেতাদের গাড়ি ভাঙচুর করেছে, সেখান থেকে নেতা-মন্ত্রীদের পালাতে হয়েছে — সেটাই ভাবছিলাম মনে মনে। ওই রকম প্রতিবাদটা না হলে কি মিডিয়ার শিরোনামে উঠে আসত একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো? কথাগুলো ভাবছি, হঠাৎ দেখি একটা খালের ব্রিজের ওপর বঙ্কিম বসে আছে। একজন অল্প বয়সি যুবক ও বৃদ্ধের পাশে বসে কথা বলছে।

আমিও ওকে দেখে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলাম, আর খাল দেখতে লাগলাম মন দিয়ে। কেন খালের জলটা এত কালো? এখানেও কি শহরের নর্দমার নোংরা জল আসছে? পাশেই দেখছি ভেড়ি রয়েছে অথচ খালের জল কালো। বৃদ্ধ মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এই খালটার জল কালো কেন, এতে কারা নোংরা ফেলে? উনি বললেন, এটাতে কারখানার জল পড়ে দূষিত হচ্ছে, তাছাড়া নর্দমার জল আছে। একথা সেকথা বলতে বলতে আমি বৃদ্ধের পাশে বসলাম। আলাপ হল পাশে বসা যুবক সুব্রত ঘোষের সঙ্গে, পুলিশে চাকরি করেন গত প্রায় চার বছর। ওরা তিন ভাইয়ের দুজন পুলিশে আর একজন বিএসএফ-এ।

আমি কথা বলছি, বঙ্কিম উঠে শোকসন্তপ্ত বাড়ির দিকে যাওয়ার কথা বলল। না, বলে আমি বললাম, আমার ওখানে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। কারণ কোনো প্রশ্ন-উত্তর পর্বের সাক্ষী আমি হতে চাই না।

বঙ্কিম এগিয়ে গেলে আমি বসে বসে সত্তর উর্ধ বৃদ্ধ বিশ্বনাথ ঘোষের সঙ্গে কথায় জড়িয়ে পড়লাম। এখানকার চাষের কথা, পুকুরের মাছের কথা, নারকেল গাছের কথা। আর এখানকার ভেড়ির কথা।

কথায় কথায় উনি জানালেন এখানে ওনাদের দুই পুরুষের বাস। ওনার বাবা এসেছিলেন প্রায় একশো বছর আগে, তখন এসব ফাঁকা জায়গা। ওনারা পাঁচজন এসেছিলেন এখানে। এসেছিলেন বাগদিদের একজনও। আজ সেখান থেকে ঘোষপাড়া, বাগদিপাড়া ও পশ্চিমে মুসলমানপাড়া। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে ওনারা চাষই করতেন, আর খাল ও পুকুরের মাছ ধরতেন। তখন এখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যেত। খালের জলের সঙ্গে নোনা জল মিশে বহু রকমের মাছ ছিল, যা আজ আর পাওয়া যায় না। বলতে বলতে উনি নিজেই বেলে, ট্যাংরা, কই, শোল, মাগুর, বেলে, মৌরলা সহ বেশ কয়েক ধরনের মাছের নাম বললেন, যা আমি মনে রাখতে পারলাম না। আগে সেইসব মাছের স্বাদ ছিল অন্যরকম। এখন আর ওনার মাছ খেতে ভাল লাগে না। কারণ মাছের কোনো স্বাদ নেই। ওষুধ দিয়ে মাছের দফারফা হয়ে গেছে। সব ভেড়ি হয়ে যাওয়ার চাষ অনেকটা কমে গেছে এখানে। কেউ কেউ এখানে বাড়িতে ছোটোখাটো সবজি চাষ করে, কেউ কেউ আবার তা বাজারে বিক্রিও করে। আমি দূর অবধি তাকিয়ে দেখলাম, বড়ো দু-একটাই মাত্র নারকেল গাছ চোখে পড়ল। এখানে নারকেল গাছ এত কম কেন, বলতে উনি বললেন, আগে অনেক বড়ো বড়ো নারকেল গাছ ছিল, ওই ওরকম, বলে দূরের একটা বড়ো নারকেল গাছ দেখালেন। প্রায় বেশিরভাগই ছিল ৯০ ফুট বা একশো ফুট। এখন আর গাছ বড়ো হতে পারে না। সবাই কাঠের জন্য বিক্রি করে দেয়। সকলেরই বাড়িতে একটা দুটো করে গাছ আছে। উনি আট-নয় বছর আগেও গাছে উঠে ডাব পেরেছেন। আগে এখানে গাছে বড়ো বড়ো ডাব হত। ওনার বাবা একশো ফুট উঁচু গাছের থেকে এক কাঁদি ডাব কেটে হাতে করে নামিয়ে আনতে পারতেন। এখনকার ছেলেদের অনেকেই তা আর পারে না। বললেন, আমার ছেলেদের মধ্যে একজন মাত্র গাছে উঠতে পারে।

কথায় কথায় উনি জানালেন এখন সময় পাল্টে গেছে। এই ভেড়ি হয়ে সব গণ্ডগোল বেড়েছে। আমি বললাম, আপনাদের তো সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। উনি আস্তে আস্তে গা নামিয়ে জানালেন, এখানে পঞ্চায়েতে তৃণমূল দাঁড়িয়েছে, ওদের বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী দাঁড়ায়নি। মারের ভয়ে। পাশের গ্রামে একজন দাঁড়িয়েছিল, তারা এখন বাড়ি ছাড়া। সিপিএম থেকে বলেছিল সহযোগিতা করবে, কিন্তু করেনি। এখানে মার খাওয়ার ভয়ে কেউ দাঁড়াতে চায়নি। এখন আর ভোট দেওয়া যাবে না। পরে বিধানসভায় যদি সিপিএম বা কংগ্রেস জেতে, তখন পরের বার হয়তো ভোট দেওয়া যাবে। এখন আর কিছু বলা কওয়া যাবে না। বলে উনি বললেন, পাটিতে আজ যারা আছে তাদের হাতে তরোয়াল বন্দুক আছে, আমাদের ঘরে কিছু নেই। আগে লাঠি ছিল, এখন আর লাঠি দিয়ে পারা যাবে না। আমি কথা বলতে বলতে বঙ্কিমকে দেখলাম কালো মুখ করে আসছে। এসে আমাকে বলল, চল শ্রীমান। আমি কথা বলতে থাকায় ওকে এগিয়ে যেতে বললাম। বিশ্বনাথ ঘোষের সাথে কথা বলতে বলতে আমি লক্ষ্য করছিলাম, দুজন তিনজন সবসময় আমাদের কথা শুনছে আর গোগ্রাসে গিলছে আমরা কী আলোচনা করছি।

কামদুনির নৃশংসতায় গ্রেফতার হওয়া আটজনের মধ্যে একজন

ভোলানাথ ও কাজ করেনি, বলছে কামদুনির কেউ কেউ

বঙ্কিম, কামদুনি, ১৫ জুন •

কামদুনি গ্রামের প্রান্তেই ভোলানাথ নস্করের বাড়ি, পাশেই বড়ো জলাশয়। একটু বিচ্ছিন্ন একটা বাড়ি, ইটের দেওয়াল, টালির চাল। আজ বাড়িটা আরও বিচ্ছিন্ন। ভোলানাথ (৫০) তার গ্রামেরই মেয়ের বীভৎস হত্যা ও ধর্ষণে অভিযুক্ত।

অদূরেই তার বাড়ির কাছেই এক বৃদ্ধ বসে আছেন, তার কাছে শুনলাম ভোলানাথের কথা। ভোলানাথ সেদিন সেই ‘ধর্ষণভূমি’তে সকালে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসেছে দুপুরের মধ্যে। যদিও ঘটনা ঘটে দুপুরের পর। তবুও যারা সেই পাঁচিলে ঘেরা ধর্ষণভূমিতে নেশা করত, ওই বীভৎসায় অভিযুক্ত হয়ে ধৃত, তাদের সাথে মিশত। গ্রামের আরও এক বয়স্ক মানুষ বিশ্বনাথ ঘোষ সহ আরও কয়েকজন বলল, ভোলানাথ একাজের সাথে যুক্ত নয়। তবুও সে পুলিশের জালে ধর্ষণ ও হত্যায় অভিযুক্তদের সাথে।

আজ এই বাড়িটি এমন স্তব্ধ যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ওখানে জনপ্রাণী আছে। দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে ভোলানাথের স্ত্রী এলেন। অসুস্থ। তাঁর চোখমুখ দাঁড়িয়ে গেছে। বললেন, মেয়েটির কাকা, বাবার সাথে কথা বলেছেন। তারা বলেছে, যে তারা বলবে যে ভোলানাথ এর মধ্যে নেই। গ্রামবাসীরা ভোলানাথের জন্য গণস্বাক্ষর করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু এখন কিছু করতে পারছে না কেউই। অসহায় হয়ে মহিলা একদিন ২৪ ঘন্টা চ্যানেলের একজন প্রতিনিধিকে তার কথাটা জানিয়েছিল। কিন্তু তারা বলেছে, দেখুন আপনার এই কথা এখন আমরা প্রচার করতে পারব না।

ভোলানাথের ছেলে তাকে দেখতে থানায় গিয়েছিল। সারাদিন সেখানে ঘোরাঘুরি করেছে। আবার একদিন কোর্টেও গেছিল। সেখানেও এক মুহুরি হাজার দুয়েক টাকা নিয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। আরও বিশ হাজার টাকা তার কাছে চেয়েছে। ছেলেটি রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে। কোথা থেকে সে এত টাকা জোগাড় করবে? ভোলানাথের দুটি মেয়ে বিবাহিত। এক মেয়ে ও জামাই ছোট্ট দু-টি নাতি-নাতনি নিয়ে এই সময় মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি বলল, এখন কী করব, সবার হাতে পায়ে ধরতে হবে। জানি না, কেমন করে বাবাকে ছাড়াতে পারব। আমরা উকিল কোর্ট এসব কিছুই বুঝি না। ভোলানাথের নাতি-নাতনিরা আজও জানে দাদু হাসপাতালে আছে। ছেলে অসহায় হয়ে বলল, ‘শুনেছি ১৮ জুন কেস উঠবে আদালতে। আপনারা কোনো উকিলের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন কম পয়সায়?’

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আশপাশ থেকে পাড়া প্রতিবেশী মহিলারা এসে সমবেদনা জানিয়ে গেল।

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

বর্ধমানের জামালপুরে বুড়োরাজ শিবের পুজো
মেলা আর অস্ত্রের প্রদর্শনী

২৮ মে, সুব্রত দাস, বদরতলা, মেটিয়াব্রুজ •

আমার সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক দাদা পঙ্কজ নাথ একদিন দুপুরবেলা ফোন করে আমাকে বর্ধমানের পাটুলির জামালপুর গ্রামের বুদ্ধপূর্ণিমার মেলা দেখতে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। যথারীতি ২৪ মে শুক্রবার আমি পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশনের বড়ো ঘড়ির তলায় দুপুর তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট আগে। পঙ্কজদা আগেই পৌঁছে গেছেন। ওঁর সঙ্গে ছিলেন ওই গ্রামের বাসিন্দা দুর্লভবাবু, তাঁর দোকানের দুজন কর্মচারী এবং একজন প্রাবন্ধিক রীতেশ দেব। পরিচয় পর্ব সেরে নেওয়া হল। টিকিট আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল। আমরা সকলে ট্রেন ধরলাম। তিনটে পনেরো মিনিটে ট্রেন ছাড়ল। আমরা নবদ্বীপ স্টেশনে নামলাম সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। ওখানেই সন্ধ্যা ছ-টায় আবার উঠলাম কাটোয়া লোকালে। সাড়ে ছ-টায় পৌঁছালাম পাটুলি স্টেশনে।

দুর্লভবাবুর নেতৃত্বে আমরা যাচ্ছি ওঁরই গ্রামের বাড়িতে। সকলে একটা মোটরচালিত ভ্যানে চেপে বসলাম। ভ্যানওয়ালা জানালেন, 'বাবু, ভ্যান জামালপুর পর্যন্ত যাবে না, নিমদহ ঘোষপাড়ার মোড়ে নেমে যেতে হবে।' দুর্লভবাবুও তাতে সায় দিলেন, 'কিছু করার নেই, রাস্তায় এত ভিড় যে ওর পর যাওয়ার পারমিশন প্রশাসন দেয় না।' নিমদহ ঘোষপাড়া পাটুলি স্টেশন থেকে সাত কিলোমিটার। স্টেশন রোড পার হয়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর চোখে পড়ল, বেশ কয়েকটা দল চলেছে, তাদের পরনে লাল রঙের পোশাক। সকলের হাতে তরোয়াল, খাঁড়া, টাঙ্গি, তাসার মতো বাজনা, সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা ভেড়া/ছাগল। অনেকটা আমাদের মেটিয়াব্রুজে মহরমের সময় যেমন 'হায় হুসেন, হায় হুসেন' বলতে বলতে মানুষ ছোটে, সেরকম ছোটো ছোটো কুড়ি-পঁচিশজনের দল। দুর্লভবাবু জানালেন, 'এরা সব মন্দিরে যাচ্ছে'। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ভ্যান নমদহে পৌঁছাল। ওখানে দেখি, আমাদের মেটিয়াব্রুজের মতোই বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে রাস্তার ওপর। গ্রামের রাস্তার চৌমাথায় খাঁকি উর্দিধারী পুলিশ বসে রয়েছে। আমরা সেখানে থেমে চা খেলাম। তারপর ওইসব দলের পিছন পিছন আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তায় আলো নেই। ওইদিন দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। পিচ রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও প্যাচপ্যাচে কাদা মাড়িয়ে আমরা এগোলাম। আমরা একদিকে এগোচ্ছি আর অন্যদিকে আর একদল লোক পুজো দিয়ে ফিরছে। মোড়ে মোড়ে আলো এবং বিনামূল্যে ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করেছিল বেশ কয়েকটা রাজনৈতিক সংগঠন। জনসমুদ্র ঠেলে চার কিলোমিটার রাস্তা দেড় ঘন্টায় অতিক্রম করে আমরা দুর্লভবাবুর বাড়িতে পৌঁছালাম। মাঠের পাশেই ওঁদের দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির দোতলার একটা ঘর আমাদের থাকার জন্য খুলে দেওয়া হল। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, হাজার হাজার ভক্ত চলেছে মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

আমরা তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে। দুর্লভবাবুর বাবা বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত কবাডি কোচ, আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর বললেন, 'আমি মন্দিরে যাচ্ছি, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। আমি সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।' রাস্তায় নেমে দেখি, অবাক কাণ্ড! এক-একটা দলের সঙ্গে টাঙ্গি, খাঁড়া, বল্লম, তীর-ধনুক, তরোয়াল তো রয়েইছে, হাতে বাঁধা বোম রয়েছে। এমনকী অনেক দলে ওয়ান-শটার, পাইপগান পর্যন্ত রয়েছে। তারা নাচতে নাচতে 'জয়বাবা বুড়োরাজ' বলতে বলতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাদা প্যাচপ্যাচে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের ওপর একচালা খড়ের ছাউনি। কিন্তু দেওয়াল আর মেঝে মোজাইক টালি দিয়ে বাঁধানো। তবে শিবলিঙ্গের চারপাশে তিন মিটার বাই দু-মিটার সম্পূর্ণ মাটির। ওই সমতল মাটির ভিতর প্রায় এক ফুট গভীরে এবং মাটি থেকে দু-ইঞ্চি ওপরে উঠে রয়েছে। মাটির অংশটা লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। গ্রিলের ভিতরে দুজন সেবাইত রয়েছে। আগত ভক্তরা গ্রিলের ওপর দিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালছে। বরুণবাবু তাঁর আত্মীয় সেবাইত নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা এই পুজো সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলাম।

কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় চার-পাঁচশো বছর আগে যদু ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে একটা গরু ছিল। গরুর বাছুর থাকা সত্ত্বেও সে এক ফোঁটা দুধ দিত না। কিন্তু প্রতিদিন নিয়ম করে বাড়ি থেকে চড়তে বেরিয়ে পড়ত। যখন বাড়ি ফিরত, দেখা যেত তার বাঁট ফাঁকা। গৃহ-মালিক একদিন ওই গরুর পিছু নেন। পিছন পিছন এসে লক্ষ্য করেন যে গরুটা জঙ্গলের মধ্যে এই জায়গায় এসে দাঁড়াতেই আপনাআপনি তার বাঁট দিয়ে দুধ পড়ে। যদু ঘোষ ঘটনাটা পূর্বস্থলীর জমিদার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে জানান। এরকম দু-তিনদিন লক্ষ্য করার পর গ্রামের কিছু মানুষজনকে নিয়ে ওই জমিদার জায়গাটাতে আসেন। সেখানে হাতখানেক মাটি খোঁড়ার পর এই শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। আর যেদিন এই শিবলিঙ্গ সকলের সামনে প্রকাশ পায়, সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা।

চলবে

বৌমাষষ্ঠী নেই, তবে জামাইষষ্ঠী আছে কেন?

সোমা সরকার, কোচবিহার, ১৫ জুন •

মাথাটা আমার আর লোড নিতে পারছে না। নিজের অজান্তেই আমি অপূর্বর ঠোঁট দুটো চেপে ধরলাম। সকাল থেকেই জামাইষষ্ঠী যেন জামাই পুজোর সমার্থক হয়ে উঠেছে। মাকে দেখলাম সকাল সকাল উঠে স্নান সেরে পুজো করল। তারপর অপূর্বকে বসিয়ে পূজোর ঢঙে আচার নিয়ম পালন করে, এক থালা ফল সামনে দিল আর সঙ্গে চলল সকাল দুপুর ও রাতের রাজকীয় আহারের আয়োজন।

এটাই আমার প্রথম জামাইষষ্ঠীতে বাপের বাড়ি আসা। এটাই কি শেষ? ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠার সময় মন যেভাবে গুছিয়ে উঠেছিল আজ অপূর্বর কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো লাগছে। হ্যাঁ! সত্যিই তো জামাইরা শাশুড়িদের ডেকে একটাও পুজো বা উৎসবের আয়োজন করে না? প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা শাশুড়িদের নিয়ে জামাইদের করণীয় কোনো বিধান রাখেননি কেন? বর্তমানে শাশুড়িদের জামাইরা যে উপহার দেয় সেটাই বা কতদিন আগে শুরু হয়েছিল? আমরা মেয়েরা বাঁশ আর খড়ের কাঠামো না হয়ে জাগতিক ছোটোখাটো পারিবারিক উৎসবে ছেলেদের পূজনীয় বা বরণীয় হয়ে ওঠেনি কেন? 'বৌমাষষ্ঠী' , 'কন্যাষষ্ঠী' এ সব কোথায়? — আরও অনেক অনেক প্রশ্নে আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম। মানে আমার মনের পুরোনো ধারণাগুলো সব লজ্জা লুকোনোর জায়গা পাচ্ছিল না। সত্যিই তো, জামাইষষ্ঠী নিয়ে শাশুড়ির এত লোড কেন থাকবে? এই সব ভাবতে ভাবতে আমার এক বান্ধবী 'জয়া'-কে ফোন করলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা জয়া জামাইদের নিমন্ত্রণ করে শাশুড়িরা যে জামাই পূজা করে সেটা কি তোর ঠিক বলে মনে হয়?' উত্তরে জয়া বলল, 'আরে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস কী করবি বল? এটাই নিয়ম। সামনের জন্মে ছেলে হয়ে জন্মাস, তাহলে জামাইষষ্ঠী খেতে পারবি'।

ছোটোবেলায় একটা গান শুনতাম, 'বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা, বুঝিবে তুমিও রাধার পরাণে কত ব্যথা'। গানটিতে মেয়েরা পুরুষদের সমব্যথী হিসেবে পাশে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। পরাণের ব্যথার উৎসগুলোকে খুঁজে দেখার সামর্থ্য নেই। ইচ্ছার প্রশ্নও নেই। অনেক যুগ পেরিয়ে আজকে আমরা মেয়েরা পরাণের ব্যথাগুলোকে এই জন্মেই সমাধান না করে আর একটি জন্মের অপেক্ষা করে আছি। পুরুষ জন্ম। সেখানে পুরুষকে সমব্যথী নয় নিজেই পুরুষ হয়ে ব্যথা প্রশমনের কথা ভাবছি। একেবারে 'তোরে বানাইয়া রাই বিনোদিনী আমি হইব কালাচাঁদ'। এই কালাচাঁদ হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে বিনোদিনী 'আমরা' কিন্তু থেকেই যাচ্ছি। হায় জয়া, জয়ার মেয়ে-জন্ম, জয়ার ছেলে-জন্ম আর জামাইষষ্ঠীর চক্র।

বেশের মেলায় পোড়ামাটির মুখোশের স্টল

সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর-মজিলপুর, ১৬ জুন, ছবি প্রতিবেদকের তোলা •

ধন্বন্তরি কালিবাড়ির পিছনে রাস্তাটার নাম কালিমাতা সরনি তার পরেই পুকুর। রাস্তা আর পুকুরের মাঝে কয়েকটা স্টল রয়েছে। গোটা তিনেক জিলিপি খাজা গজা ইত্যাদির দোকান তার পরে ছোটো একটা স্টল শাহজাদাপুরের সনৎ হালদারের (৩১) টেরাকোটা মাস্কের অর্থাৎ পোড়ামাটির মুখোশের। ওর বাবা ছিলেন জনমজুর। ১৫ বছর আগে বাবা মারা যান। তিন ভাই আর মায়ের দায়িত্ব এসে পড়ে ওর ওপর। ওদের চাষের কোনো জমি নেই, তাই স্কুলে ফাইভ থেকে নাইন পর্যন্ত পড়ার সময় শ্রীপুরের অরবিন্দ কয়ালের কাছে শেখা পোড়া মাটির কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়। ওর এক ভাই কলকাতায় ফুটপাথে রুমাল বিক্রি করে আর এক ভাই জনমজুরের কাজ করে। এখানে ও কিছু রুমালও রেখেছে যদি পোড়ামাটির মুখোশ বিক্রি না হয়, তবে অন্তত স্টল ভাড়ার খরচটা যাতে ওঠে। ওর মা শিবানি হালদারের(৪৮) ক্যান্সার হয়েছে এ ব্যাপারে খুব চিন্তিত স্বাভাবিক কারণেই। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এখন বাড়িতেই আছেন । চিকিৎসা ও কেমোথেরাপির খরচ ফ্রী অর্থাৎ লাগছে না। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে ১২০০-১৩০০ টাকার ওষুধ কিনতে হয় মায়ের জন্য। আমাকে বলছিল কাতর স্বরে, দেখবেন যদি কিছু করা যায়। বললাম, দেখ ভাই আমি তোমার মতো এক সাধারণ মানুষ, আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তবে আমাদের ছোটো পত্রিকায় লিখলে যদি তোমার কিছু উপকার হয় তা

করতে পারি। বড়ো অসহায় লাগে এইসব সময়। সনৎয়ের স্টল দেখে যেটা মনে হল, গ্রামীণ জনমজুর বা কৃষকের বা নিম্নবিত্ত পরিবারের থেকে যে ঐতিহ্যবাহী পুতুলশিল্পীরা আসত সেটা কমে গেছে, তার কারণ কি সেই সেই পুতুলের মার্কেট বা বাজার আর নেই তেমন? তার বদলে আধুনিক পোড়ামাটির কাজ জায়গা করে নিচ্ছে কিনা বা বাজারের খোঁজে সেই সব পরিবার আধুনিক শিল্পরীতির দিকে ঝুঁকছে কি না এটা একটা পর্যবেক্ষণের বিষয় এইসব মেলাগুলোতে।

খ ব রে দু নি য়া

তুরস্কের গেজি পার্কের সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জনবিদ্রোহে পরিণত

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ জুন, সঙ্গের ছবিতে গেজি পার্ক. তথ্য ও ছবিসূত্র উইকিপিডিয়া •

২৭ মে থেকে ফের 'অকুপাই' আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল তুরস্ক। রাজধানী ইস্তাম্বুলের গেজি পার্ক নামের একটি সবুজ অধ্যুষিত পার্ক ধ্বংস করে সেখানে শপিং মল এবং আবাসন বানানোর সরকারি পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে ২৭ মে জনা পঞ্চাশেক পরিবেশপ্রেমী মানুষ জড়ো হয়েছিল। কিন্তু সরকার ২৮ মে জোর করে সেখানে পার্ক ধ্বংস করা শুরু করে। প্রতিবাদে শুরু হয়ে যায় গেজি পার্কের মধ্যে তাঁবু বানিয়ে পাহারা দেওয়া। ২৯ মে তুরস্কের এর্দোগানের সরকার জোর করে সেই ক্যাম্পগুলি ভেঙে দিতে যায়। শুরু হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ এখনও চলছে। দফায় দফায় সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষও চলছে। কোনো বড়ো রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে অংশ নেয়নি। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী থেকে ধর্মীয় লোকজন, ফুটবল ফ্যান থেকে অ্যানার্কিস্ট, কমিউনিস্ট থেকে সংখ্যালঘু কুর্দ জাতির মানুষ, পুরুষ-মহিলা-বাচ্চা-বুড়ো — দলমত নির্বিশেষে ফেটে পড়েছে তুরস্ক। দেশের রাজধানী ইস্তাম্বুল, বড়ো শহর আঙ্কারা তো বটেই, অন্তত ৪০টি শহরে হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে গেছে প্রতিবাদে।

এর্দোগানের পার্টি ২০০২ সালে ক্ষমতায় এসেছিল তুরস্কে, তখন তুরস্ক অর্থনৈতিক সঙ্কটে ধুঁকছে। সেই অবস্থায় একের পর এক রিয়েল এস্টেট গড়ে তুলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তারা। তার জোরে পরে ২০০৭ এবং ২০১১ সালে বিপুল ভোটে জিতে যায় এর্দোগান। একইসঙ্গে এই সুদীর্ঘ শাসনকালে নিজেদের পেটোয়া শিল্পপতি থেকে শুরু করে পেটোয়া মিডিয়াও বানিয়ে ফেলে। তাদের জোরেই সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে এসেছে সরকার। ২০১০ সালে নতুন করে পরমাণু চুল্লি তৈরির ঘোষণার পর ইস্তাম্বুল এবং আঙ্কারাতে মুহুর্মুহু প্রতিবাদ হতে থাকে।

২০১১ সালে তৃতীয়বারের জন্য ভোটে জিতে আসার পর থেকে এর্দোগান তুরস্ককে ইসলামিক রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামিকরণ করা হয়, সমকামীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হতে থাকে, গর্ভপাত প্রায় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, ইউনিভার্সিটি চত্বরে ছাত্রদের মধ্যেও নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

রিয়েল এস্টেট তৈরির প্রক্রিয়ায় গত দশকে রাজধানী ইস্তাম্বুলকে প্রায় সবুজ শূন্য করে ফেলা হয়। গেজি পার্ক ছিল ব্যতিক্রম। গেজি পার্ককে ভেঙে একটি পুরোনো মিলিটারি ব্যারাক তৈরির নামে শপিং মল এবং আবাসন তৈরির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রথম পিটিশন করা হয়েছিল। সেই পিটিশনে সাড়া দিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বাতিলও করেছিল। কিন্তু মে মাসের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবন পায়। শুরু হয় গেজি পার্ক ধ্বংসের তোড়জোড়। সামান্য কিছু মানুষের তা সশরীরে আটকে দেওয়ার মরিয়া প্রতিরোধ জাগিয়ে দিয়েছে গোটা তুরস্কের মানুষকে।

ব্র্যাডলি ম্যানিং মোটেই অপরাধী নয়
সে আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে

দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকার ১০ জুন সংখ্যায় এলেন ডেভিডসনের রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে •

১ জুন ব্র্যাডলি ম্যানিং-এর সমর্থনে প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে কয়েক শত মানুষ মেরিল্যান্ডের ফোর্ট জর্জ মিয়াদে-তে মিছিল করে। এখানে রয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর আর্মি ইনস্টলেশন। ৩ জুন থেকে শুরু হয়েছে ব্র্যাডলি ম্যানিং-এর বিচার। ভেটারান ফর পিস, ইরাক ভেটারানস এগেনস্ট দ্য ওয়ার, কারজ টু রেজিস্ট ইত্যাদি সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনটি বাস ভর্তি মানুষ নিউ ইয়র্ক থেকে এসে এই মিছিলে যোগ দেয়। ২৫ বছরের যুবক ব্র্যাডলি ম্যানিংয়ের বিরুদ্ধে রয়েছে ২২টি অভিযোগ। মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করার সূত্রে সে ইরাক ও আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের কুকীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে। মার্কিন সরকারের কূটনৈতিক কেবল-বার্তা, রিপোর্ট সহ ১০ লক্ষ ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট জনসমক্ষে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। ২০০৭ সালে ইরাকে নিরস্ত্র জনতার ওপর মার্কিন সেনাদের আক্রমণের ভিডিও 'কোল্যাটারাল মার্ডার' প্রকাশ করেছে। মার্কিন সরকারের কাছে সে দেশের শত্রুর বন্ধু! কিন্তু খোদ মার্কিন দেশেই গড়ে উঠেছে 'ব্র্যাডলি ম্যানিং সাপোর্ট কমিটি'। প্রতিটি যুদ্ধ-বিরোধী মানুষের সে বন্ধু। মিছিলে ওয়ার্ড রেইলি বলেন, 'এদেশে সত্য কথা বললে জেলে যেতে হয়। ... আমাদের দায়িত্ব এটা দেখার যে ব্র্যাডলির জায়গায় যুদ্ধাপরাধীদের যাতে জেল হয়।' অনেকেই বক্তব্য রাখেন। তাঁদের সার কথা ছিল, প্রতিদিন যা ঘটে চলেছে আমাদের চোখের আড়ালে সেগুলো ব্র্যাডলি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, সে মোটেই অপরাধী নয়।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.